এক মহান বিপ্লবী : ‘মহারাজ’

সুদীপ সেন

‘জেলে ত্রিশ বছর’ বইটির যিনি লেখক তাঁর নাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী হলেও তিনি ‘মহারাজ’ নামেই অধিক পরিচিত। অথচ মজার ব্যাপার হল, ‘লেখক’ কিংবা ‘মহারাজা’—এ-দুইয়ের কোনওটাই তিনি ছিলেন না, তাঁর পরিচয় অন্য—আর সে-পরিচয় একজন বিপ্লবীর। একজন পরিপূর্ণ মানুষ ও আদর্শ বিপ্লবী বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। শ্রীঅরবিন্দ বাঘা যতীন সম্পর্কে একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে, এই মানুষটি বিশ্বের যে-কোনও দেশের প্রথম সারির মানুষদের মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কেও একই কথা বললে হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের একজন। জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ৫ মে (২২ বৈশাখ, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার), বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার কাপাসাটিয়া গ্রামে। তাঁর ঘটনাবহুল বিপ্লবীজীবন ছিল বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো।

সাল ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিল। নেতাদের নির্দেশমতো দেশবাসী বিদেশি দ্রব্য বর্জন করতে আরম্ভ করল। ত্রৈলোক্য তখন নিতান্তই বালক, স্কুলের ছাত্র। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ তাঁর ক্ষুদ্র গ্রামে এসে লাগল এবং তা আলোড়ন তুলল তাঁর কিশোর হৃদয়ে। অল্পবয়স থেকেই তাঁর মধ্যে নির্ভীকতা, পরোপকার ও দেশপ্রেমের প্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। স্রষ্টা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র মহাশয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুলিন দাস কার্যত দলের নেতা হন। পুলিনবাবুর অসাধারণ সংগঠনক্ষমতার জোরে এই সমিতি দ্রুত বাংলার সর্বত্র বিস্তারলাভ করে। ত্রৈলোক্য ১৯০৬ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে এই সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

সভ্য হওয়ার অল্প কদিনের মধ্যে তাঁকে জেলে যেতে হল—জীবনে প্রথমবার। পড়াশোনায় তিনি বেশ ভালই ছিলেন এবং শিক্ষক মহাশয়রা তাঁর কাছ থেকে ভাল ফল আশা করতেন। কিন্তু অল্প বয়সে সমাজ-সংসার সব ছেড়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলামোচনে ব্রতী হওয়ার দরুন প্রথাগত শিক্ষায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

মহারাজ নামে তাঁর পরিচিতিলাভ করার পিছনে কারণ আছে। ময়মনসিংহের তদানীন্তন জমিদার

ছিলেন মহারাজা খেতাবধারী শশিকান্ত চৌধুরী। বিপ্লবীজীবনে পুলিশের নজর এড়াতে ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁর আসল পরিচয় গোপন করে বহুবার বহু ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। একসময় তিনি শশিকান্ত নামে আত্মপরিচয় দিতেন। বিপ্লবী বন্ধুরা তাই মজা করে তাঁকে 'মহারাজ' বলে ডাকতেন। কালক্রমে এই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হন।

ত্রৈলোক্যনাথের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জেলে ত্রিশ বছর' থেকে জানা যায়, একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিলেন। আর একবার গায়ে রীতিমতো জ্বর নিয়ে তিনি পদব্রজে বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পলাতক অবস্থায় তাঁকে নানাস্থানে নানাভাবে থাকতে হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায়, ''কখনো মাঝি, কখনও চাকর বা কুলি, কখনও বড়লোক সাজিয়াছি।'' কোথাও বা তিনি নিজেকে আইনের ছাত্র বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শ্রেণির ছাত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন। আবার বন্দি বিপ্লবীদের বিচারের ফলাফল জানার অভিপ্রায়ে এই দুঃসাহসী মানুষটি আদালত প্রাঙ্গণে অনেক সময় ছদ্মবেশে ডাবও বিক্রি করেছেন।

কালীচরণ মাঝি নামে তিনি একসময় খ্যাত ছিলেন। মাঝি সেজে পূর্ববঙ্গের সব বড় বড় নদীতে বহুদিন নৌকা চালিয়েছেন। বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কতবার পদ্মানদী পারাপার করেছেন। একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী ও স্বদেশি ডাকাতদলের নেতা হিসেবে তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য সরকারপক্ষ থেকে অনেক টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ বহুবার তাঁর সন্ধান পেয়েও তাঁর অভিনয়নৈপুণ্যে তাঁকে সাধারণ গ্রাম্য মাঝি ভেবে ছেড়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ও তার পুলিশবাহিনীর কাছে এই বিপ্লবী বরাবর ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। অথচ তাঁর গ্রামের লোকে তাঁকে শান্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির বলেই জানত। অবশ্য তাদের এই ধারণা মিথ্যা ছিল না, কারণ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তিনি খুবই ঠান্ডা মাথায় সম্পন্ন করতে পারতেন। আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন মহারাজের 'জেল-হিস্ট্রি' টিকিটে তাঁর পূর্ববর্তী পরিচয় লেখা ছিল নিম্নরূপ :

The accused was one of a gang of Bengali students concerned in a conspiracy; a conspiracy to wage war against the king Emperor and whose operations extended from the year 1908 to December 1914. He was a member of Anushilan Samiti, a society whose object was to overthrow the British rule in India and whose members committed several dacoities to procure money for the purchase of arms and ammunitions and the carrying out of the business of the society. He was one of the earlier members, took training from the arch anarchist P. Das. He absconded while the Dacca Conspiracy Case was started. He was one of the leaders of the Revolutionary Party–was suspected in 14 murders and dacoities, very dangerous.

মহারাজ যে-নৈপুণ্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে, শান্ত-সমাহিত চিত্তে ডাকাতিকার্য পরিচালনা করার পরক্ষণেই নিরক্ষর গ্রাম্য মাঝি সেজে নদীতে নৌকা বাইতেন তা ভাবলে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। বড়লোকের বাড়িতে পাঞ্জাবি সর্দারের বেশে ডাকাতি করতে গিয়ে তিনি সেই বাড়ির অসুস্থ মানুষের সেবাও করেছেন। একবার তাঁর দলের একজন অল্পবয়স্ক বিপ্লবী ডাকাতির সময় উৎসাহের

আতিশয্যে এক মহিলার গায়ের গয়না কাড়তে গেলে মহারাজ কর্তৃক তীব্রভাবে তিরস্কৃত হন। বিপ্লবী জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'নমামি' গ্রন্থে মহারাজের ক্রিয়াকলাপের কাহিনি পড়ে চমৎকৃত হতে হয়।

মহারাজের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্বল্পাহার ও অনিয়মের ফলে তাঁকে হাঁপানিতে ধরল, পরে তা রূপান্তরিত হল যক্ষ্মায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও মহারাজ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে দেশের স্বাধীনতাই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। তাই বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকল অব্যাহত গতিতে। এইসব স্বাধীনতা সংগ্রামী খুব কৃচ্ছ্রসাধন করে দিন কাটাতেন। বিশেষ করে মহারাজ যেভাবে চলতেন তা ছিল অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে প্রেরণার উৎস।

মহারাজ প্রথম কলকাতায় আসেন ১৯১২ সালে। তারপর থেকে তাঁর বিপ্লবী জীবনের বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে এই মহানগরীতে। মহারাজের কলকাতাবাসের বর্ণনা পাই তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে : ''আমরা খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতাম। কলকাতা শহরে আমাদের বাসা ভাড়ার জন্য তিন-চার টাকার বেশি খরচ হইত না। খাবারও ছিল অতি সাধারণ—সকালে মুড়ি, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে ডাল, ভাত অথবা মাছের ঝোল ভাত। কোনও কোনওদিন আমাদের দুইটি তরকারিও হইত আর কোনও কোনও দিন সম্পূর্ণ উপবাসেও থাকিতে হইত। আমাদের বাসায় কোনও আসবাব থাকিত না—আসবাবের মধ্যে থাকিত বিছানা, তাহাও অতি সাধারণ। বাসার সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম। আমরা কখনও থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে যাইতাম না। আমি যখন প্রথম কলিকাতা যাই তখন শশাংকবাবু দুই আনা খরচ করিয়া বায়স্কোপ দেখাইয়াছিলেন, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে তখন বায়স্কোপ ঘর ছিল। আমাদের পান, তামাক, সিগারেট খরচও ছিল না। রাস্তায় আমাদের কুলির প্রয়োজনও হইত না—সাধারণত পায়ে হাঁটিয়াই চলাফেরা করিতাম। কলিকাতায় তখন বাস ছিল না—বিশেষ জরুরি কাজ না থাকিলে ট্রামেও উঠিতাম না। শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট সাধারণত আমরা হাঁটিয়াই যাইতাম। আমাদের সাধারণত একটা জামার বেশি দুইটা জামা থাকিত না। জামা-কাপড় আমরা ধোপাবাড়ি দিতাম না, নিজেরাই জামাকাপড় পরিষ্কার করিতাম। একবার শীতকালে আমি স্থির করিলাম একটি গরম কোট কিনিব। তখন আমার কাসি হইতেছিল, দোকানে গিয়া সস্তা গরম কোটের অনুসন্ধান করিলাম। দোকানে ইঁদুরে কাটা অনেকগুলি তালি দেওয়া কোট ছিল, আমি তাহারই একটি কম দামে কিনিয়া আনিলাম। অসুখ-বিসুখ হইলে আমরা সাবু-বার্লির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম, ডাক্তারের ধার বিশেষ ধারিতাম না। অবস্থা খারাপ হইলে একমাত্র ডাক্তারের নিকট যাইতাম।''

ইংরেজের কারাগারেই অতিবাহিত হয়েছে মহারাজের জীবনের সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর। স্বভাবতই কলকাতার একাধিক এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু জেলে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। সেইসময় জেলে যতরকমের সাজার ব্যবস্থা ছিল প্রায় সবরকম সাজাই তিনি ভোগ করেছেন। দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান যাওয়ার সময় তিনি হাঁপানিতে রীতিমতো কষ্ট পাচ্ছিলেন। যাত্রার আগে জেলার সাহেব এসে বললেন, ''তুমি সেখানেই মরবে।'' কিন্তু মহারাজের জীবনীশক্তি ছিল বিস্ময়কর। জেলারের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়নি। মহারাজের কথায় : ''যাত্রার সময় আমাদের মনে যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ে আমরা বেশ হাসি-খুশিই ছিলাম।'' ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি তাঁরা আন্দামান

পৌঁছলেন। মহারাজ লিখছেন, ''আমার যৌবনে যখন আমার ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, ডান্ডাবেড়ী পায়, ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষে দিনরাত্রি যখন আমি আবদ্ধ, তখনও মনে করি নাই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে, তখনও আমার মনে এই ধারণাই ছিল যে, পনের বৎসর আর কতদিন, দেখিতে দেখিতে পনের বৎসর কাটিয়া যাইবেই। ইতিমধ্যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়, আমি জেল হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিব।''

এই হচ্ছেন মহারাজ। আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, ধ্রুবতারার মতো স্থির অচঞ্চল তাঁর লক্ষ্য, যার জন্য সর্বস্বত্যাগে তিনি সদাই প্রস্তুত। হিমালয় পর্বতের মতো অটল, অনমনীয় তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে সকল প্রতিকূলতাই বুঝি হার মানে। আন্দামানে কয়েদিদের দুঃসহ জীবনের এক নিখুঁত চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর' বইখানিতে। বন্দিদের প্রতি যে-অমানুষিক ব্যবহার করা হত তার প্রতিবাদে মহারাজ ও আরও একদল বিপ্লবীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং জেল কর্তৃপক্ষের হাতে কঠিন শাস্তিভোগ করা ছিল বাস্তবিকই এক মহৎ দৃষ্টান্ত। বিপ্লবীজীবনে সমসাময়িক কালের অনেক প্রথম সারির নেতার সঙ্গে মহারাজের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ নেতাজীর খুবই প্রিয় ছিলেন। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ব্রহ্মদেশের বেশ কিছু জেলেও মহারাজকে কাটাতে হয়েছে। মান্দালয় জেলে সঙ্গী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

জেলে থাকাকালীন মহারাজ গীতাভাষ্য লেখেন, লেখেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী বেশ কিছু বইও। দুঃখের বিষয়, নানা অসুবিধার দরুন সেগুলি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হতে পারেনি। তিনি গীতার যে-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেন তার মূল কথা হল—শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন জ্ঞানমার্গ কিংবা ভক্তিমার্গ কোনওটাই অবলম্বন করেননি—তিনি যুদ্ধ করেই পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মহারাজের সমগ্র জীবনটাই ছিল যেন গীতার আদর্শে পরিচালিত। বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ তাঁর লেখা 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে এই মহান বিপ্লবীর এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন : ''মহারাজ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সুদিনে দুর্দিনে তিনি অবিচলিত। কৃতকার্য হইলেও উৎফুল্ল নহেন, অকৃতকার্য হইলেও অবসাদগ্রস্ত নহেন। গীতায় আছে, কর্মেই অধিকার, ফলে নহে, মহারাজকে গীতার শ্লোক আওড়াইতে শুনি নাই, কিন্তু গীতার ওই বাণী তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়াছে দেখিয়াছি। যে সাধনায় মানুষ সমাহিত হয়, আত্মস্থ হয়, আত্মারাম হয়—যাহার সন্ধান পাইলে মানুষের ভোগের স্পৃহা থাকে না, রাগ-দ্বেষ থাকে না, লোভ নিঃশেষ হইয়া যায়, সে সাধনা হয়ত তাঁহার ছিল। তবে কখনও কোনও ধ্যানধারণা বা সাধনা করিতে তাঁহাকে দেখি নাই।''

বাস্তবিকই মহারাজ ছিলেন আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি' ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁর নিজের ভাষায়, ''আমি কখনও ভীরু ছিলাম না—আমার জীবনে কখনও দুর্বলতা দেখাই নাই। আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থলোভ আমার ছিল না... মৃত্যুভয় আমার ছিল না, কোনো দুঃসাহসিক কার্যে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমি কখনও অলস ছিলাম না, কঠিন পরিশ্রমের কাজে কখনও ভীত হই নাই; যখন যে কাজ করিয়াছি, আন্তরিকতার সহিতই করিয়াছি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জেলে বেশির ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার কাটিয়াছে, জেলে এবং জেলের বাইরে ৫৮ বৎসর

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু দেশ আজ পর্যন্ত স্বাধীন হইল না।" মহারাজ দমদম জেলে তাঁর বিপ্লবীজীবনের কাহিনি যখন লিখতে বসেন তখন ১৯৪৬ সাল, তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। অবশ্য মহারাজ স্বাধীনতার পরও সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়াতে তিনি যে যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু দেশবিভাগ তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। স্বাধীনতার পর থেকে অবশিষ্ট জীবন তিনি অতিবাহিত করেন পূর্ব বাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) এবং অবশ্যই তা অলসভাবে নয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বদেশের কল্যাণচিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

ব্যক্তিগত জীবনে মহারাজ ছিলেন সাদাসিধে, দরদি ও রসিক মানুষ। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর ভালবাসা। সদা প্রসন্নচিত্ত, সমুদ্রহৃদয় এই চিরকুমার মানুষটি যে কত বড় রসিক ছিলেন, তাঁরই বর্ণিত নিম্নলিখিত ছোট্ট ঘটনাটি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

''একদিন বৈকাল ৪টার সময় একা ইডেন-উদ্যানে বসিয়া আছি এমন সময় একটি গুপ্তচর আসিয়া আমার নিকট বসিল। সে সম্ভবতঃ আমাকে একা নীরবে বসিতে দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, তাই নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। যখন জানিতে পারিল যে আমার যক্ষ্মাকাশ হইয়াছে, এখানে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি এবং দুই-চারিবার কাশিতেও দেখিল তখন সে একটু সরিয়া বসিল এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি বিবাহ করিয়াছি কি না। আমি বলিলাম, বিবাহ তো একটা করি নাই, দুইটা করিয়াছি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীটি নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমি আরও দুঃখ করিয়া বলিলাম, আমার তো সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন ভাবি ইহাদের কি উপায় হইবে। সে আমাকে খুব বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে বহুবিবাহ অন্যায়। আমিও উত্তর করিলাম অদৃষ্টের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারে না। অতঃপর সে চলিয়া গেল। গুপ্তচরটা জানিত না যে সে এতক্ষণ যাহার সহিত আলাপ করিতেছিল তাহার নামে পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে।"

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭০ সালে এদেশ সফরে এসে আগস্ট মাসের ৯ তারিখে এই মহাপ্রাণ বিপ্লবী আকস্মিকভাবে অমরলোকে প্রয়াণ করেন। মহারাজের ঘটনাবহুল সুদীর্ঘ জীবনের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, আর তা এই রচনার উদ্দেশ্যও নয়। এই মহাপুরুষের জীবন নিয়ে পরবর্তী কালে কোনও মহাগ্রন্থ রচিত হলেও তা এই গুরুদায়িত্ব পালনে হয়তো সম্পূর্ণ সফল হবে না, কারণ বিপ্লবী কিংবা সাধকজীবনের পুণ্যকাহিনির অনেকাংশই চিরকাল আত্মগোপন করে থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে; আর বিপ্লবী মহারাজের সমগ্র জীবনটাই ছিল এক নিরলস সাধনা। ✠

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর স্মৃতি

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ ছিলেন ভক্তপ্রিয়, ভক্তবৎসল। মাতৃভাব ও সাধুভাবের যুগপৎ প্রকাশ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অসাধারণ মাত্রা দিয়েছিল। পূজনীয় মহারাজের স্নেহধন্য শ্রীঅজয় কুমার ভট্টাচার্যের এই স্মৃতিগ্রন্থটি সেই মহনীয় চরিত্রের এক বিশ্বস্ত প্রতিবেদন। মূল্য : ২৫ টাকা